নকশালবাড়ির ঘটনা–ফিরে দেখা

সমরেশ মিত্র

‘নকশালবাড়ি’ একটি গ্রামের নাম হলেও তা ক্রমে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ৫০ বছর আগে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। এরপরের কয়েক বছরে তা ভারত ও বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতিকে নানা মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। ভারতে কৃষক ছাড়াও অসংখ্য তরুণ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। কলকাতাও এই আন্দোলনের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো। বিচারবহির্ভূত রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ডের শিকার কতোজন হয়েছেন তার হিসাব এখনও পাওয়া যায় না। ‘নকশালবাড়ি’ নামটি খুবই পরিচিত হলেও এই আন্দোলনের জন্ম ও বিকাশ, শক্তি ও সংকট নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা কমই আছে। এই প্রবন্ধে তৎকালীন প্রকাশিত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এর শুরুর ঘটনাবলী অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই লেখাটি নেওয়া হয়েছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক অনীক পত্রিকার ‘নকশালবাড়ি: ৫০ বছর’ বিশেষ সংখ্যা থেকে।

আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে ২৪ এবং ২৫ মে ১৯৬৭, উত্তরবঙ্গের একেবারেই অবজ্ঞাত এক এলাকা, নকশালবাড়ী অঞ্চলে এক কৃষক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। তারপর, সমর সেনের ভাষায়, নকশালবাড়ীর ঘটনার পর আর কোনো কিছুই আগের মতো রইল না। এটা কিভাবে ঘটতে পারল? একটি ‘অখ্যাত’ স্থানীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেই গ্রামটির নাম, নকশালবাড়ী, কিভাবে সারা ভারতে কৃষক আন্দোলনের তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক নতুন ধারার প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে উঠল, কেন, নকশালবাদ বা নকশালপন্থী কিভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি ধারার নাম হয়ে উঠল, সেই বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় চর্চা আজও জনসমক্ষে হয়নি। নানা কল্পকাহিনি, অর্ধসত্য আর অসত্য এবং বিকৃত প্রচারের তলায় চাপা পড়েছে আসল কাহিনি। ৫০ বছর পর এখন সময় এসেছে নির্মোহ দৃষ্টিতে সেই অতীতের দিকে চোখ ফেরানোর, ঘটনার একটি বাস্তবভিত্তিক নির্মাণের।

নকশালবাড়ীর ঘটনা নিয়ে উল্টো দিকের দুটি ভিন্ন শিবির বিরূপ প্রচার চালায়। একটি শিবির অবশ্যই সেই জমির মালিকশ্রেণি, যাদের মৌরসিপাট্টায় বাদ সেধেছিল নকশালবাড়ী আন্দোলন। তাদের বিরূপ প্রচারের ছকটি পরিচিত–কৃষকদের দাবি অন্যায্য, আইন তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, হিংসার আশ্রয় নিয়ে লুটপাট-খুন-জখম-রাহাজানি চালিয়েছে।

অন্য দলে পড়ে সংসদীয় বাম দলগুলো। আশ্চর্যজনকভাবে তাদের অভিযোগগুলো, অন্তত নকশালবাড়ীর ঘটনার ক্ষেত্রে, জোতদারদের অভিযোগপত্রের প্রায় হুবহু প্রতিলিপি–সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘বাম হঠকারিতার’ অভিযোগ, ‘বেআইনি, উগ্রপন্থী’ পথে যাওয়ার অভিযোগ। মোটমাট, এই প্রশ্নে ভারতীয় কমিউনিস্ট ঘরানা সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ঘটনার সূত্রপাত

প্রথমেই বলা দরকার যে নকশালবাড়ীর কৃষি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তৎকালীন সিপিআই (এম) পার্টির জেলা ও মহকুমা নেতৃত্বের দ্বারা। আচমকা কোনো ‘উগ্রপন্থী’ গোষ্ঠী ‘বাইরের মদদে’, সিপিআই (এম)-এর সাধারণ দিশার বাইরে গিয়ে, তৎকালীন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতির বাইরে গিয়ে কোনো ‘নতুন’ কিছু করার চেষ্টা করছিল–এমন নয়।

যে ঘটনাটি নকশালবাড়ী বিক্ষোভ ঘটনার পেছনে অনুঘটকের কাজ করেছিল সেই ঘটনাটি ঘটেছিল সম্পূর্ণতই একটি আইনি পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে। ঘটনার বিবরণে যাওয়ার আগে আমরা দেখি সিপিআই (এম) দলটির তখন কৃষি প্রশ্নে কী অবস্থান ছিল।

৮ এপ্রিল ১৯৬৭ প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার কিছু সিদ্ধান্ত নেন এবং তারপর সরকারি সিদ্ধান্ত হিসেবে সেগুলো প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। মনে রাখা দরকার যে এই সমস্ত ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৬৬-র অক্টোবরে বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া অঞ্চলে সারা রাজ্য কিষান সভার সম্মেলনে (যে সংগঠনের সভাপতি ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার স্বয়ং) গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক। এই সম্মেলনে দার্জিলিং জেলার যে আটজন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরাও এই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে সহমত পোষণ করেন এবং রাজ্য কিষান সভার নেতৃত্ব এঁদের কাজের প্রশংসাও করেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন ছিলেন জঙ্গল সাঁওতাল- যিনি সিপিআই (এম) পরিচালিত শিড়িগুড়ি মহকুমা কিষান সভার সভাপতি ছিলেন। যে নির্বাচনে জিতে সিপিআই (এম) যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ শরিক হয়েছিল, সেবার জঙ্গল সাঁওতাল ফাঁসীদেওয়া বিধানসভা ক্ষেত্রে সিপিআই (এম)-এর প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, ভোট পান ১০,৪৮৪, মোট ভোটের প্রায় ২৬ শতাংশ; যদিও তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের টি ওয়াংদির কাছে প্রায় ৬ হাজার ভোটে পরাজিত হন।

৩০ মার্চ ১৯৬৭ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার একটি অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে ভাগচাষি কৃষকের মৃত্যুর পর সেই ভাগচাষির চাষরত বা চাষবাসে সক্ষম উত্তরাধিকারীকে যাতে উচ্ছেদ করা না যায় এবং ব্যাপক উচ্ছেদ থেকে বর্গাদারদের রক্ষা করা যায় তার জন্য ভূমি সংস্কার আইনের বর্গাদার অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। এই বিতর্কে অংশ নিয়ে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেন–

আমূল ভূমি সংস্কার করে সর্বরকম বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা করা একটি জটিল সমস্যা। বর্তমান সামাজিক-আর্থিক কাঠামোতে এই সমস্যা পুরোপুরি সমাধান সম্ভব নয়। যুক্তফ্রন্ট সেই অবস্থায় পৌছানোর জন্য আন্দোলন করবে। ইতিমধ্যে সীমিত সুযোগে বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষার্থে এবং বেনামি জমি উদ্ধার করার কাজে যুক্তফ্রন্ট সরকার সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলনকে সমর্থন করবে। বর্গাদার উচ্ছেদ রহিত করার ও বেনামি জমি উদ্ধার করার প্রশ্নে পুলিশ জোতদারদের পক্ষে যাবে না। বর্গাদাররা দুর্বল, তাই আইনের ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতা বর্গাদারদের পক্ষে যাবে।
(বসুমতী, ১/৪/১৯৬৭)

কোঙারের নতুন নীতির মূলকথা

১। ব্যাপক হারে বর্গাদার ও ভাগচাষি উচ্ছেদ সরকার বন্ধ করবে;
২। উচ্ছেদ বন্ধের জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে;
৩। বর্গাদারদের নিজস্ব উদ্যোগে জমি থেকে উচ্ছেদ প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হবে;

৪। বর্গাদাররা উচ্ছেদ বন্ধের জন্য প্রতিরোধে সক্রিয় হয়ে উঠলে এই সক্রিয়তার বিরুদ্ধে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করার কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখা হবে। (বসুমতী, ২/৪/১৯৬৭)

নকশালবাড়ীতে এ পর্যন্ত যা আন্দোলন হয়েছে তা আইনি চৌহদ্দির মধ্যেই–নেতৃত্বে রয়েছেন সিপিআই (এম)-এর স্থানীয় নেতারা। কৃষক আন্দোলনে পুলিশ যাবে না–সরকারপক্ষের এই ঘোষণায় জমি বিরোধ সংক্রান্ত নানা মামলার পাহাড় জমতে থাকে শিলিগুড়ি আদালতে। ঠিক এমনই একটি জমি বিরোধ সংক্রান্ত মামলা ছিল ভাগচাষি বিগল কিষান বনাম জমির মালিক বুদ্ধিমান তিরকের। একটাই হয়তো, সামান্য তফাত ছিল শিলিগুড়ির কোর্টে জমে থাকা জমি বিরোধ সংক্রান্ত পাহাড়প্রমাণ মামলার সঙ্গে এই মামলাটির। বিগল কিষান ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষান সভার একজন সক্রিয় কর্মী এবং জোতদার বুদ্ধিমান তিরকে ছিলেন যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত একটি প্রভাবশালী পার্টির কাছের মানুষ। এই মামলায় মুনসেফ আদালতের রায় যায় বিগল কিষানের পক্ষে–আদালত বলে বুদ্ধিমান তিরকে, বিগল কিষানকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। প্রজা হিসেবে বুদ্ধিমানের জমিতে তার ভাগচাষের আইনি অধিকার স্বীকার করতে হবে। মামলার এই ডিক্রির পর সেই আইনি অধিকার প্রয়োগ করার জন্য বিগল কিষান তাঁর জমিতে লাঙল নিয়ে চাষ করতে যান। কিষান সভার অভিযোগ ছিল, জোতদাররা ওই অঞ্চলে আদালত, পুলিশ, দেশের আইন–কিছুই মানে না; তাদের কথাই আইন। অথচ তারা কথায় কথায় থানায় গিয়ে কৃষকরা আইন ভাঙছে বলে অভিযোগ করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিগল কিষানের ওই জমিতে চাষ করার সাংবিধানিক ও আইনসংগত অধিকার জোতদার বুদ্ধিমান তিরকে অস্বীকার করেন–জোতদারের লেঠেল বাহিনী (এই লেঠেল বাহিনীর ওপর তখন সমগ্র শিলিগুড়ি মহকুমাতেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল) বিগল কিষানকে চাষ করতে বাধা দেয়। বিগল কিষানের নিজের কথা–

> মার্চ থেকে মে ১৯৬৭–এই তিন মাসে এক শর বেশি এমন ঘটনা ঘটেছে। যখন জোতদাররা জোর খাটিয়েছে তখন সংবাদমাধ্যম নিশ্চুপ; যখন কিষান জোর খাটিয়েছে তখন সংবাদমাধ্যমে সেই ঘটনা এসেছে।

'জোতদারের গুণ্ডাদের লাঠির ঘায়ে মাঠে পড়ে গেলাম। খরব রটে গেল, জঙ্গলের নেতৃত্বে শয়ে শয়ে চাষি লাঠি হাতে রে রে করে এলো। জোতদারের গুণ্ডারা ভয়ে পালাল। তখন জঙ্গলের নাম শুনেই জোতদারদের হার্ট অ্যাটাক হতো। ... ঠিক হলো, জোতদারদের গ্রামে থাকতে দেব না। কোটিয়া, লালজি, ছোটো মরিনাশ, চাকনা, প্রসাদজোত–চারদিকেই জোতদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাতে লাগল। আওয়াজ উঠল–লাঙল যার, জমি তার।' বিগল কিষান একটু দম নিয়ে বললেন, '২৪ মে সকালে খবর পেলাম, হাতিঘিষার বড়ঝড়ুজোতে পুলিশ এসেছে। চারদিক থেকে মাঠের পর মাঠ দৌড়ে পেরিয়ে হাজার হাজার চাষি পৌঁছল হাতিঘিষায়। জোতদারের স্বার্থে পুলিশ এসেছে চাষিদের ধরতে। পুলিশকে আমরা গ্রামেই ঢুকতে দেব না। প্রত্যেক চাষির হাতে হয় লাঠি, নয় তীর-ধনুক। টুকুরিয়া চা-বাগানের শ্রমিকরা কাজ করছিল। খবর পেয়ে হাতিঘিষায় জড়ো হয়ে চাষিদের সামনে লাঠি হাতে দাঁড়াল। চাষিরা ঘিরে ফেলল পুলিশকে। হাজার হাজার চাষি-শ্রমিক, লাঠি আর তীর দেখে পুলিশরা বন্দুক ফেলে পালাল। ইন্সপেক্টর সোনাম ওয়াংদি ও নকশালবাড়ী থানার একজন অফিসারের বুকে তীর বিঁধল। সোনাম ওয়াংদি মারা গেল।' (আজকাল, ২৫/০৫/১৯৯২)

বিগল কিষানের মতো অভিজ্ঞতা নকশালবাড়ী অঞ্চলের কৃষকদের আগেও হয়েছে। আইনি মতে পাওনা ধান জোতদাররা তাদের প্রজাদের নিয়ে যেতে দেয়নি–কৃষকের ন্যায্য অংশকে কৃষকরা যতক্ষণ না ধার হিসেবে গ্রহণ করছে, ততক্ষণ কৃষকদের জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। মার্চ ৩, ১৯৬৭। ফাঁসীদেওয়া থানার একটি অখ্যাত ঝোতে তিনজন ভাগচাষি–লাপা কিষান, সঙ্গু কিষান ও বাতিয়া কিষান কিষান সভার শখানেক মানুষ নিয়ে জোতদারের এই বেআইনি প্রথার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং শুধু নিজেদের নয়, জোতদারের অংশও জোর করে নিয়ে যায়!

মার্চ থেকে মে ১৯৬৭–এই তিন মাসে এক শর বেশি এমন ঘটনা ঘটেছে। যখন জোতদাররা জোর খাটিয়েছে তখন সংবাদমাধ্যম নিশ্চুপ; যখন কিষান জোর খাটিয়েছে তখন সংবাদমাধ্যমে সেই ঘটনা এসেছে। এই একশোটা ঘটনা তেমনই।

নকশালবাড়ী অঞ্চল কৃষি প্রশ্নে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোঙারের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রী-মিশন প্রেরণ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই মন্ত্রী-মিশনে বাংলা কংগ্রেস, প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি পার্টির (এরা সকলেই যুক্তফ্রন্টের অংশীদার ছিল) সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা জোতদার এবং চা-বাগান মালিকদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের যতটা সময় দেন তার পাঁচ শতাংশ সময়ও তাঁরা কিষান আন্দোলনের নেতাদের দেননি। পার্টির ম্যান্ডেট মারফত কৃষক আন্দোলনের নেতা কানু সান্যালের সঙ্গে একান্তে এবং নিভৃতে সাক্ষাৎ করেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। এই সাক্ষাৎকারের বিষয়ে পরবর্তীকালে হরেকৃষ্ণ কোঙার ও কানু সান্যাল প্রায় বিপরীত কথা বলেছেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন, তিনি কৃষক কানু সান্যালকে আন্দোলন তুলে নেয়ার কথা বলেন এবং বলেন যে আন্দোলনকারীরা একটি নির্দিষ্ট দিনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলে একসময় তাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় কেস তুলে নেয়া হবে। সরকার থেকে কমিটি বানিয়ে, কৃষকদের সেই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে বিডিও-এসডিও প্রভৃতির নেতৃত্বে ভূমিবন্টন কমিটি গঠিত হবে। কানু সান্যাল তাঁর বয়ানে এই ভাষ্য অস্বীকার করেন। জোতদারদের বিরুদ্ধে বেআইনি কাজের জন্য মামলা হবে কি না, তাদের শাস্তি হবে কি না সে বিষয়ে শ্রী কোঙাল নীরব থাকেন।

ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসে, পুলিশের আনাগোনা বাড়ে। পুলিশ ঘেরাও শুরু করে। বিগল কিষান বলেছেন–

২৫ মে প্রসাদজোতে মহিলা সমাবেশ ডাকা হয়েছিল আন্দোলনের কথা বলার জন্য। সেই সমাবেশের নেতা বেঙ্গাইজোতের প্রহ্লাদ সিং। এখানে পুলিশ হঠাৎ গুলি চালায়। ১১ জন নিহত হয়। তার মধ্যে ৭ জন মহিলা ও ২টি শিশু। একটি শিশু ছিল প্রহ্লাদ সিংয়ের স্ত্রীর পিঠে বাঁধা অবস্থায়। রাইফেলের গুলি প্রহ্লাদের স্ত্রী ধলেশ্বরী দেবীর বুক ভেদ করে পিঠের বাচ্চাটিকেও খুন করে। (আজকাল, ২৫/০৫/১৯৯৩)

এবার আমরা বিনা মন্তব্যে আনন্দবাজার পত্রিকার ২৭ মে ১৯৬৭-র এসংক্রান্ত খবরটি উদ্ধৃত করছি।

নকশালবাড়ীর ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯

স্টাফ রিপোর্টার : শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি এলাকায় বৃহস্পতিবার (২৫/০৫/১৯৬৭) পুলিশের গুলিচালনায় মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ জন নারী, ১ জন পুরুষ ও ২টি শিশু। সকলেই সাঁওতাল। তার আগের দিন সাঁওতালদের আক্রমণে ১ জন পুলিশ

ইন্সপেক্টর তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

ওই ঘটনা সম্পর্কে শুক্রবার মহাকরণে যে খবর পৌঁছেছে তাতে এই অভিযোগ পাওয়া যায় যে মাসাধিককাল আগে থেকেই ওই এলাকায় 'বেআইনি' কার্যকলাপ চলছিল সিপিএম পার্টির 'অতি উগ্রপন্থী' অংশচালিত কিছুসংখ্যক আদিবাসী, জোতদার, এমনকি ছোটখাটো চাষিদের জমিও জোর করে দখল করছিল এবং লুটপাট ও ক্ষেতের ফসল নষ্ট করছিল। আরো অভিযোগ, ওই দলে যোগ দেয়ানোর জন্য ছোটো চাষিদের ওপর জোরজুলুমও চালানো হচ্ছিল।

পুলিশ ওই ঘটনা সম্পর্কে ৬০টি কেস করে এবং এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছিল। কিছু আগে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়কে সব জানিয়ে নির্দেশ চাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে বেআইনি কার্যকলাপ দমনের জন্য 'কঠোর ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। সেইমতো পুলিশ বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যাম্প বসায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। কতকগুলো ক্ষেত্রে এইসব লোক তীর-ধনুকসজ্জিত ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। বুধবার একটি পুলিশ বাহিনী কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করতে যায়। এক সশস্ত্র জনতা তাদের আক্রমণ করে, ফলে একজন ইন্সপেক্টর নিহত ও দুজন সাব-ইন্সপেক্টর আহত হন।

বৃহস্পতিবার এসডিও ও সাব-এসডিওর নেতৃত্বে একটি পুলিশ বাহিনী কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে অগ্রসর হলে সশস্ত্র আদিবাসী নারী ও পুরুষের একটি দল তাঁদের আক্রমণ করে। নারীরা ওই দলের আগে ছিল এবং তাদের হাতে তীর-ধনুক ছিল।

এসডিও প্রথমে আক্রমণকারীদের সতর্ক করে দেন। তারপর পুলিশ বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে। তাতে কোনো কাজ হয় না। ইতিমধ্যে দুজন কনস্টেবল আহত হন। তখন পুলিশ গুলি চালায়। তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং সাতজন আহত হন। ২৬/০৫/১৯৬৭ ওই এলাকার অবস্থা শান্ত ছিল। তিন কোম্পানি পুলিশ তখন সেখানে আছে। আরো এক কোম্পানি পাঠানো হচ্ছে। এ পর্যন্ত নকশালবাড়ী এলাকায় প্রায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার নকশালবাড়ী এলাকা ঘুরে আসার পর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১৮ মের (১৯৬৭) রিপোর্টে বলেন যে বিষয়টি শুধু আইন-শৃঙ্খলার বিষয় নয়। জমি থেকে আদিবাসীদের 'বলপূর্বক উচ্ছেদ করার' প্রকৃত অভিযোগ রয়েছে। কাজেই সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত ফয়সালা করতে হবে। তিনি আশঙ্কা করেন, অন্যথায় অবস্থার অবনতি হতে পারে।

নকশালবাড়ী এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতির হিসেবে সিপিআই (এম)-এর শ্রী কোঙাল সাংবাদিকদের কাছে বিস্তারিত খবর না জানা পর্যন্ত কিছু বলতে অস্বীকার করেন। সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও (সিপিআই) ওই সমস্যা শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন হিসেবে না দেখার ব্যাপারে কোঙারের সঙ্গে একমত। তিনি ওই এলাকার ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের এবং ব্যবসাদারদের অবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি মনে করেন, কোঙারের পথে ওই এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে ওই এলাকার ব্যক্তিগতভাবে ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সমাধান করা উচিত। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এখন অজয় মুখার্জির রিপোর্টের প্রতীক্ষায় আছেন। সম্ভবত শনিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই ঘটনার আলোচনা হবে।

সিপিআই (এম)-এর বিভিন্ন মুখপত্রের সংবাদদাতাদের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের যোগ ছিল। এই সংবাদদাতারাই চা-বাগানে ধর্মঘট, শিলিগুড়িতে বিরাট মিছিল, নির্বাচনে কৃষক-জনতার সতেজ অংশগ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে রিপোর্ট লিখতেন। তাঁরা লিখছেন–

২৭/০৫/১৯৬৭ সান্ধ্য দৈনিক গণশক্তির সম্পাদকীয় (সরোজ মুখার্জি): *'পুলিশের এই গুলিচালনার আমরা তীব্র নিন্দা করি।'*

গুলি চালিয়ে কৃষক খুন করার প্রতিবাদে ২৭/০৫/১৯৬৭ ধর্মঘট করেন তরাইয়ের লালঝাণ্ডুয়া ইউনিয়নের চা-শ্রমিকরা। শিলিগুড়িতে রেল ও রাজ্য বিদ্যু পর্ষদের কর্মীরা (শ্রমিক এবং কর্মচারী মিলিয়ে) ও চাষিরা এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করেন।

২৮/০৫/১৯৬৭ নকশালবাড়ীতে কৃষক রমণী হত্যার প্রতিবাদ জানান জ্যোতি দেবী (বা কাকিমা), নন্দরানী দল, মাধুরী দাশগুপ্ত, কনক মুখোপাধ্যায়, নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, কণিকা গাঙ্গুলি প্রমুখ সিপিআই (এম)-এর মহিলা নেত্রীবৃন্দ।

৩০/০৫/১৯৬৭ সিপিআই (এম) এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বিবৃতি

নকশালবাড়ীর সব ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই এবং পুলিশের গুলিতে নিহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নকশালবাড়ীর সমস্যা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা নয়। সমস্যা হলো সরকারি (খাস) জমি বণ্টনের। গণ-আন্দোলনের অগ্রগতির পথে জনগণ এখানে কিছু ভুল করতে পারেন।

০১/০৬/১৯৬৭ উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু: *'নকশালবাড়ীর ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই।'*

০৬/০৬/১৯৬৭ কৃষক সভার সভাপতি আবদুলাহ রসুলের বিবৃতি

নকশালবাড়ীর ঘটনাবলির পেছনে রয়েছে কৃষক বিক্ষোভের অতি ন্যায়সংগত গুরুতর অভিযোগ এবং তা-ই হলো এর মূল শক্তি। কৃষকদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ফেটে পড়ার সময় কিছু বাড়াবাড়ি হয়তো হয়েছে। এত বড় শক্তিশালী ন্যায়সংগত আন্দোলনে যে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল তা হয়তো ছিল না এবং তারই পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছে কায়েমি স্বার্থের চক্রান্তকারীরা। ...আমরা প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত সম্বন্ধে সমস্ত কৃষক ও জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। যুক্তফ্রন্টের শরিকদের আমরা অবহিত হতে অনুরোধ করছি যে কৃষক আন্দোলনের পেছনে রয়েছে বল্গাহীন জোতদারি জুলুমের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। তাকে আইন-শৃঙ্খলার নাম করে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করা যাবে না। এতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি খুশি হবে, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের কবর রচিত হবে।

০৪/০৬/১৯৬৭ পিপলস ডেমোক্রেসির প্রথম পাতায় বিটিআরের (রণদিভে) সম্পাদকীয়

'নকশালবাড়ীতে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সেনানী ছিলেন। তাঁরা শহীদ হয়েছেন।'

০৯/০৬/১৯৬৭ গণশক্তির সম্পাদকীয়

নকশালবাড়ী

...নকশালবাড়ী এলাকার কৃষক সংগ্রামের সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। জটিলতর করার জন্য মূলত দায়ী জোতদার কর্তৃক...কৃষকদের ওপর আক্রমণ এবং সরকার কর্তৃক গ্রামের অভ্যন্তরে পুলিশ বাহিনী প্রেরণ।

০৫/০৮/১৯৬৭ গণশক্তির সম্পাদকীয়

হুঁশিয়ার

বিভিন্ন জেলা এবং অঞ্চল থেকে কৃষক আন্দোলন ও কৃষক কর্মীদের ওপর জোতদারদের সংগঠিত আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ২৪ পরগনা জেলায় বিশেষ করে জোতদারদের এই আক্রমণ সংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত রূপ ধারণ করেছে। খবর পাওয়া গেছে কংগ্রেস নেতারা, দুর্ভাগ্যক্রমে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি পার্টির স্থানীয় নেতারাও অনেক অঞ্চলে তথাকথিত

প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন।

...আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জোতদাররা বহু লক্ষ বিঘা জমি বেআইনিভাবে দখল করছে।...

সিপিআই (এম)-এর তৃণমূল স্তরের কর্মীরা দীর্ঘ প্রচেষ্টায় যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, সেই সংগঠনের সভ্যবৃন্দ এখন আন্দোলনের জন্য উদ্বেল হয়ে আছেন। রাষ্ট্র তার সর্বশক্তি নিয়ে এই সংগঠিত জনজোয়ারকে প্রতিহত করতে চাইছে।

২১/০৯/১৯৬৭ গণশক্তির সম্পাদকীয়

বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী কে?

'গত ছয় মাসে যে কয়েকটি গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী কে? কংগ্রেস দল, সংবাদপত্র এবং এমনকি যুক্তফ্রন্টভুক্ত কোনো কোনো দল ও নেতা এজন্য সংগঠিত শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ওপর দোষারোপ করেছেন। সেইটাই কি বাস্তব? ঘটনা আদৌ তা নয়।

২৪ পরগনা জেলার মিনাখাঁয় কৃষকদের ঘরবাড়ি ভেঙেছে কারা? তাদের জমির ফসল কেটেছে কারা? নকশালবাড়ীর কৃষক হত্যা করেছে কারা? জমির দাবিতে সংগ্রামরত এই কৃষকদের ওপর জোরজুলুম চালিয়েছে কারা? কৃষকদের ওপর এই বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের শোষকশ্রেণি জমিদার-জোতদার দল।

আসানসোল মহকুমার শ্রমিক এলাকায়, বিশেষত কয়লা খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের ওপর অবিরাম আক্রমণ, শ্রমিক হত্যা কারা করেছে? দমদমের কারখানার শ্রমিক হত্যা কারা করেছে? যাদবপুরের শ্রমিক নেতা খুন করেছে কেন?

আসন্ন উপনির্বাচনের সমর্থনে শ্রী কোঙার এবং পশ্চিম বাংলার পার্টির রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের বক্তব্য শুনে যে কোনো আন্দোলনকারী মানুষ নকশালবাড়ীর আন্দোলনের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।'

গণশক্তির এই সম্পাদকীয় থেকে একথা পরিষ্কার যে জনজাগরণ এবং জনগণের এই স্থিতাবস্থাবিরোধী আন্দোলনকে সিপিআই (এম) পার্টি ন্যায্য বলে মনে করে।

০৩/০৯/১৯৬৭ গণশক্তি

হরেকৃষ্ণ কোঙারের বেলগাছিয়া নির্বাচন কেন্দ্রের সভায় বক্তব্য

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে গণসংগ্রাম, অবরোধ গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচনে মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হলে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্ক উচ্ছেদ করতে হবে। অর্থনীতি থেকে একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি উৎখাত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে হবে। সেই মূল লক্ষ্যের দিকে এগোতে গিয়ে যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে অতিক্রান্তিকালীন পদক্ষেপ। তিনি আরো বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে ব্রতী হবে। সংগ্রাম সমস্ত মানুষকে ময়দানে এনে ফেলেছে। অর্থনৈতিক আক্রমণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রমোদ দাশগুপ্তর বক্তব্য আরো চিত্তাকর্ষক? তিনি বলেন, প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচন। বিপ্লবের লক্ষ্যে কি সংসদীয় নির্বাচনই যেতে সাহায্য করবে? নির্বাচনে আমরা এই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না যে মন্ত্রী হব বলে। সংসদীয় মোহ থেকে জনগণকে মুক্ত করব। নির্বাচনী বিজয়ই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতকে তীব্রতর করবে। জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যখন আইন প্রণীত হবে, বাধা দেবে আমাদের মন্ত্রীরা, দিল্লিতে ধরনা দেবে না। চা, পাট বন্ধ করে দিয়ে পশ্চিম বাংলার সমস্যাপূরণে অগ্রসর হবে। তখন কেন্দ্রের বাধা আসবে। জনগণ বুঝবে সংসদীয় পথ নয়, বিপ্লবই তার জীবনের সমস্যা মেটাতে পারবে। (ঐ)

দারোগা সোনাম ওয়াংদির মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ওয়াংদির বাড়ি যান, তাঁর কিশোরী কন্যাকে সান্ত্বনা দেন। ওয়াংদির পরিবার আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ এবং বীমার টাকা পায়। মুখ্যমন্ত্রী একবারের জন্য ধলেশ্বরী দেবীর বাড়ি যাননি, যার শিশুপুত্রটি (কয়েক মাসের 'উগ্রপন্থী' শিশু!) মায়ের সঙ্গেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। অন্য ১০ জন, যাঁরা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের কারো বাড়িই প্রশাসনের কেউ যাননি। সেদিন গুলি চালানোর পাকাপোক্ত কোনো নির্দেশও ছিল না; এতৎসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত নিহত মানুষগুলোর পরিবারবার্গ কোনও ক্ষতিপূরণ পায়নি।

পুলিশ সংগঠন ওয়াংদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে, কালো ব্যাজ পরেছে। কৃষক সভার নেতারা শোক প্রকাশ করলেও, তদন্তের দাবি তুললেও কোনো শোক মিছিল করেননি। নকশালবাড়ীর ঘটনায় আজও প্রশাসন, পুলিশ, জোতদার–কেউই শাস্তি পায়নি। অথচ গ্রামের পর গ্রামের মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে।

৫ জুন ১৯৬৭ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা নকশালবাড়ীর কৃষকদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১২ জুন ১৫০০ জন বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ খুব ছোট একটি এলাকায় ঘেরাও-দমন চালিয়ে ৭০০ জন কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ৫২ দিনে নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রথম দফা শেষ হয়। শুরু হয় ইতিহাসের অন্য একটি পর্ব।

সমরেশ মিত্র: লেখক, গবেষক।

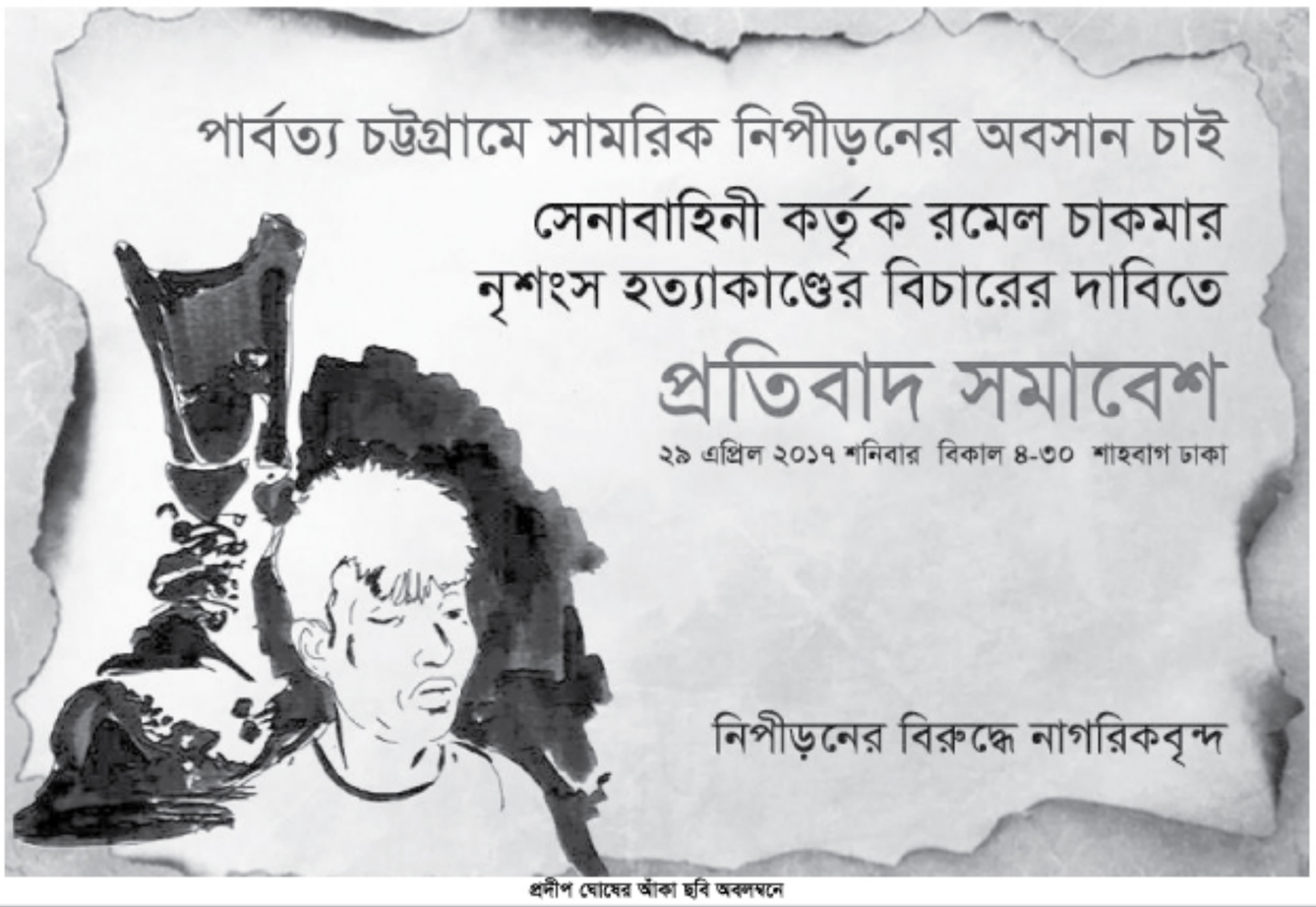

প্রদীপ ঘোষের আঁকা ছবি অবলম্বনে